Rs. 3.00

পাঁচ সিকে পাঁচ আনা

স্বামী শিবানন্দ গিরি মহারাজ প্রতিষ্ঠিত

কৈলাস-গুহা

মাসিক সংঘ পত্রিকা

ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করেছেন লীলার জন্য। খেলার জন্য। আনন্দের জন্য। আস্বাদনের জন্য। পূর্ণতার জন্য। তিনি নিজেই পূর্ণ। তবু সেই পূর্ণতাকে জানার জন্য পূর্ণ থেকে অনন্তকাল পূর্ণ বেরিয়ে আসছে। ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করেছেন, সে ঈশ্বরকে জানবে বলে। আবার পাছে এক কথায় জেনে ফেলে তাই ইন্দ্রিয়ের হাজার খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছেন।

—স্বামী শিবানন্দ গিরি



স্বামী শিবানন্দ গিরি মহারাজ

পাঁচ সিকে পাঁচ আনা
Central Regn. No.—R.N. 32810/1977
Postal Regn. No. KOL RMS/38/2025-2027
।। পঞ্চাশ বর্ষ, ২য় সংখ্যা।। আশ্বিন ১৪৩৩



শ্যামশ্যামা কৃষ্ণকালী জড়াজড়ি

মহালয়ার অমাবস্যা থেকে দেবীপক্ষ শুরু। পূজার উৎসবটা যেন কালীপূজার অমাবস্যায় এসে পূর্ণচ্ছেদ টানছে। একটু ভাল করে দেখলে লক্ষ্য করব আসলে পূজা আরম্ভ হয়েছে কিন্তু রথের দিন থেকে। সেইদিন দুর্গা প্রতিমার কাঠামো বাঁধা শুরু হয়েছে। সেইদিন থেকে কাঠামো পূজা শুরু হয়ে গেছে। ঝুলনের মধ্যে খড় বাঁধা শেষ হওয়া চাই। জন্মাষ্টমীর দিন মাটি পড়বে। অন্ততঃ একমাটি হয়ে থাকা চাই। ক্রমশঃ দেবীর রূপ গড়া হচ্ছে। মহালয়াতে চোখ আঁকা হয়ে গেছে। সাজ সজ্জা চলছে। অলংকার ভূষণ প্রহরণ চালচিত্র বসে গেল। পূজারপর দশমীতে নিরঞ্জন হল। বিসর্জন কিন্তু হল না। লক্ষ্মীপূজা এখনও বাকী। শঙ্খধুনি করে কোজাগরী পূর্ণিমায় পূজা সমাপন করেই কালীপূজার প্রতীক্ষা। কিন্তু কালীপূজাতে কি উৎসব শেষ হল? না। আরও পনেরোটা দিন পর রাসপূর্ণিমা। রাসপূর্ণিমায় পূর্ণ মিলন। পূজার পূর্ণাহুতি। গোপীরা কাত্যায়নীর পূজা করে কৃষ্ণকে পেয়েছিলেন। এ শুধু এক দিনের একটা ঘটনা নয়। প্রতি বছর কাত্যায়নীর বোধন করে যে কৃষ্ণ পাওয়ার সকাম উপাসনা শুরু করি কালীপূজায় সে যজ্ঞের পূর্ণাহুতি দিয়ে নিষ্কাম মদনমোহন গোবিন্দের মিলনানন্দ পাই।

কি অদ্ভুতভাবে শ্যামশ্যামা জড়াজড়ি করে আছেন। নইলে রথের দিন থেকে বা কেন কাঠামো বাঁধা হবে। রথের দিন ভগবান মন্দির থেকে বেরিয়ে আসেন। মানুষের কাছে আসার জন্য, সকলের অঙ্গ স্পর্শ করার জন্য তিনি নেমে আসেন রাস্তায়। উঠে বসেন রথে। শুধু রশি ধরে টানবার অপেক্ষা। যারা ঘরে নিয়ে যেতে চাও, অন্তরের মণিকোঠায় নিয়ে যেতে চাও, তারা এসো, দড়ি ধরে টান দিয়ে নিয়ে যাও। আমি সেজে গুজে বসে আছি। আমায় নিয়ে যাও। কি করুণা!

যে ঈশ্বরকে ব্রহ্ম বলে জেনেছে, অনিলে অনলে দেখেছি, নির্গুন নিরাকার বলে ছড়িয়ে দিয়েছি, সে-ই প্রেমঘন, ঘণীভূত রূপ নিয়ে আমার দৃষ্টিপথে অপেক্ষা করছেন। দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে, চোখে অশ্রু বাঁধ মানে না, এ কল্পনার অতীত। তুমি নিজে এসেছ, দাঁড়িয়ে আছ। এ আনন্দ আমি কোথায় রাখি।

তাই রথের দিন কাঠামো বাঁধা হয়ে গেল। এবার চোখের অনুশীলন শুরু। চোখের দেখাটি মনের দেখার সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া। মনের দেখাকে চোখের সামনে মেলে ধরা। দেখলেই দেখা হয় না। তাই দেখার একটা ক্রমিক অনুশীলন আছে। ঠিক ক্রমিক পাঠ নেবার মত। দালানে ঠাকুর এসেছেন। সবে তো কাঠামো। কার বাড়ীর দালান বড় কথা নয়। আমার মন ঐ দালানেই পড়ে আছে। কুমোরের হাতে ক্রমশ

রূপ নিচ্ছে। আমার চোখ একটু একটু করে প্রস্তুত হচ্ছে। তারপর পূজায় মন্ত্রে আচার অনুষ্ঠানে সে রূপ সার্থক হয়ে উঠছে। শিল্পী যেটুকু এঁকেছে, তার থেকে অনেক বেশী দেখছি। কল্পনা নয়। সত্য। নিত্য সত্য। শাশ্বত সত্য। সত্যের শুধু ঐশ্বর্য, মাধুর্যও আছে। সেটি খুঁজে পেলেই আনন্দ।

জন্মাষ্টমীতে মায়ের একমাটি হওয়া চাই। মথুরায় জন্মাষ্টমীতে যে মুহূর্তে শ্রীকৃষ্ণ জন্মেছেন সেই মুহূর্তে গোলকে মহামায়া কন্যারূপে জন্ম নিয়েছেন যশোদার গর্ভে। সে কন্যা কংসের হাত থেকে উড়ে গিয়েছে আকাশে। দুর্গারূপে আবিভূতা হয়ে নিজ পরিচয় দিয়ে সাবধান করে দিয়ে গেছেন। তারপর সেই দেবী গেলেন কোথায়? রইলেন কোথায়? এ প্রশ্নের উত্তর শ্রীশ্রীচন্ডীতে আছে। মহিষাসুর বধ করে তিনি পর্বতবাসিনী হলেন। বললেন, 'আমি বিন্ধ্যাচলনিবাসিনী'। বললেন, 'আমি নন্দগোপগৃহে জাতা যশোদাগর্ভসম্ভবা'। এই যশোদা গর্ভজাতার প্রতিমাটিতে জন্মাষ্টমীর দিন প্রথম মাটি দিতে হবে, এটা কি অর্থপূর্ণ হয়ে উঠছে না? দেবী চন্ডীকা তিনভাবে পূজিতা। সত্ত্বভাবে, রজভাবে, তমভাবে। সত্ত্বভাবে তিনি মহা সরস্বতী তিনি মহাদুর্গা। মহাসরস্বতী শুধু বিদ্যা নয়, রণদেবীও বটে। রজভাবে মহালক্ষ্মী পূজা। তমভাবে তিনি মহাকালী। সত্ত্বভাবে দুর্গাপূজার পর রজভাবে-মহালক্ষ্মীর পূজা। তারপর কামরূপ কামেশ্বরীর সকামপূজা মহাকালীর। লক্ষ্য করতে হবে গ্রন্থের নাম শ্রীশ্রীচন্ডী। শ্রীশ্রীচন্ডীর প্রথম মন্ত্র ওঁ নমঃশ্চন্ডিকায়ৈ। অথচ চন্ডীর কোন কাহিনী নাই শ্রীশ্রীচন্ডীতে। আছে তিনটি গাথা। মধুকৈটভবধ। মহিষাসুর বধ। শুম্ভনিশুম্ভ বধ। তন্ত্রসিদ্ধ শান্তি আশ্রমের স্বামী সত্যানন্দ গিরি বললেন, এই তিনটি রূপের একীভূত রূপই চন্ডী রূপ, তাঁরই নাম 'বৈষ্ণবীদেবী'। সত্ত্বরজতম একত্রে কল্পনা করা যায় না। তাই এই রূপের বর্ণনা নাই।

দেবীর বহুরূপের মধ্যে আবার এই বৈষ্ণবীরূপ আমাদের ভাবিয়ে তোলে। সত্যানন্দজীর ব্যাখ্যামত সে রূপ আবার তিনটি রূপের সমাহার। একীভূত মূর্তি। তাই দুর্গপূজা, লক্ষ্মীপূজা, কালীপূজার পরই রাসপূর্ণিমায় শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন এই চিন্তাকে পরিস্ফুট করছে। সাধকতন্ত্র পূরাণের একটি চমৎকার শ্লোক মনে পড়েছে।

শচীসূতচ্ছলাৎ কৃষ্ণ কলাব বতরিষ্যতি।
যা কালী সৈব তারা সাৎৎ যা তারা ত্রিপুরহি সা।
ত্রিপুরা যা মহাদেবী সৈব রাধা ন সংশয়।
যা রাধা সৈব কৃষ্ণ স্যাৎ য কৃষ্ণ স শচীসূতঃ

যে কালী, স তারা। যে তারা সেই ত্রিপুরা। যে ত্রিপুরা সেই মহাদেবী। যে মহাদেবী সেই রাধা। যে রাধা সেই কৃষ্ণ। যে কৃষ্ণ সেই শচীসূত।।

জগন্নাথের মন্দিরে বসেছিলাম। ভোগ লেগেছে। ভোগের পর দর্শন পাব। পূজারী পদ্মনাভ পান্ডা প্রসাদ নিয়ে এলেন। জিজ্ঞাসা করলাম, কি মন্ত্রে ভোগ দিলেন? আমার কপালে টিপটা বারবার দেখছিল পান্ডাঠাকুর। বললেন, আপনাকে ভালবাসি, আপনি হয়তো বুঝবেন। সবাই তো অর্থ বোঝে না! মন্ত্রটি শুনে অবাক।

তারা সাক্ষাৎ শূলপাণি সুভদ্রা ভুবনেশ্বরী।
নীলাচলে জগন্নাথ সাক্ষাৎ দক্ষিণাকালী।।

তবু আমাদের শ্যামশ্যামা অভেদ জ্ঞান হল না।

—স্বামী শিবানন্দ গিরি



শ্রীশ্রীঠাকুর বিশ্বনাথদেবের স্মরণতিথি পূজা এবং 'কৈলাস'-এর নিবেদন 'KAILASH-SHIVANANDAM' WEBSITE.

গত ১১ই সেপ্টেম্বর ২০২৬, শুক্রবার আনন্দ আশ্রমে পরম শ্রদ্ধা এবং ভক্তির সঙ্গে পালিত হল শ্রীশ্রীঠাকুর বিশ্বনাথদেবের ৭৮তম স্মরণতিথি পুজা। বিকাল ৪টা থেকে শুরু হল নাম-সংকীর্তন। ভক্তকণ্ঠে উচ্চারিত নাম-সংকীর্তনে মুখরিত হল আশ্রম। শ্রীগুরুর শিক্ষায় সকল ভক্তকণ্ঠে নামোচ্চারণে এক স্বর্গীয় পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। এক প্রহরের নাম-সংকীর্তন বিশ্রাম নেয় বেড়া কীর্তনের মধ্য দিয়ে। এরপরে কিছু সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের স্মৃতিকথায় এবং বিশ্লেষণে।

কীর্তনের ঘর থেকে আমরা সবাই এসে জড়ো হই ঠাকুরদালানে। অনেক স্মৃতি-বিজরিত এই দালান-মন্ডপে পালিত হবে আমাদের প্রিয় পত্রিকা 'পাঁচ সিকে পাঁচ আনা'র ৫০ বৎসর পূর্তি উৎসব এবং 'কৈলাস' সংস্থার Website "KAILASH-SHIVANANDAM" শুভ উদ্বোধন।

প্রথমে কৈলাসের সম্পাদক স্মৃতি থেকে তুলে ধরলেন সেই পঞ্চাশ বছর আগের স্মৃতিকথা। মহারাজ কিভাবে এবং কি উদ্দেশ্যে শুরু করেছিলেন এই পত্রিকা এবং পাঠাগার? মহারাজ চেয়েছিলেন কীর্তনে মানুষ যা শুনছে তা স্মরণে রেখে পাঠাগারের গ্রন্থের মধ্যে সেই সত্যকে খুঁজে নিয়ে তারপর নিজের অনুভূতি এবং সাধনার প্রকাশ করুক পত্রিকার মধ্য দিয়ে। আমরা জানিনা মহারাজের সেই উদ্দেশ্য কতটা সফল করতে পেরেছি তবু পঞ্চাশ বছর ধরে শুধু আমাদের প্রাণপ্রিয় মহারাজের কথা এবং শিক্ষাকে সামনে রেখে প্রায় নিয়মিত এই পত্রিকা প্রকাশ করতে পেরেছি এটা অবশ্যই তাঁর কৃপা-আশীর্বাদ। এই পত্রিকা শুরু হয় ১৯৭৭ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর, তখনও কিন্তু 'কৈলাস' সংস্থার জন্ম হয়নি। মহারাজের প্রিয় সন্তান কৈলাস ঘোষ দক্ষিনেশ্বরের গঙ্গায় স্নান করতে গিয়ে ডুবে যান ১৯৭৮ সালের ৩০শে এপ্রিল। মহারাজ তাঁর প্রিয় সন্তানের স্মৃতিতে 'কৈলাস' সংস্থা গড়ে তোলেন ১৯৭৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এবং তখনই 'পাঁচ সিকে পাঁচ আনা' পত্রিকা এবং 'আনন্দম্ গ্রন্থাগার' 'কৈলাস' সংস্থার অর্ন্তগত হয়। পত্রিকাটি দীর্ঘদিন মহারাজের আরও এক সন্তান শ্রীবিশ্বজিৎ মজুমদারের (হরিদাস) তত্বাবধানে 'কুডোস প্রিন্টার' প্রেস থেকে সম্পাদিত এবং মুদ্রিত হয়। পরবর্তীকালে অবশ্য কিছু প্রয়োজনীয় পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু এই পত্রিকা তার উদ্দেশ্য থেকে কখনই সরে না এসে আজ তার পঞ্চাশ বছর পূর্ণ করল।

এর পরে শ্রীমতি প্রণতি ঠাকুর তাঁর সযতনে সঞ্চিত স্মৃতি থেকে পুরানো দিনের অনেক বিস্মৃতপ্রায় তথ্য এবং সংবাদ তুলে ধরলেন। আমাদের এই আনন্দম্ গ্রন্থাগার এবং পাঁচ-সিকে-পাঁচ-আনা পত্রিকার প্রথম দিককার অনেক ঘটনার অমূল্য স্মৃতি-চারণায় আমরা সকলেই সমৃদ্ধ হলাম।

এরপরে শুরু হল 'কৈলাস'-এর Website "KAILASH-SHIVANANDAM"-এর শুভ উদ্বোধন। সকলের উপস্থিতিতে বড় স্ক্রীনের পর্দায় যখন মহারাজের প্রাণবন্ত চিত্রগুলি এবং 'কৈলাস'

সংস্থার নানরকম সমাজসেবামূলক কাজগুলি প্রদর্শিত হচ্ছিল আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই এক অনির্বচনীয় আনন্দের প্রকাশ এটা প্রমাণ করে আমাদের আনন্দ আমরা ছড়িয়ে দিতে চাই জগতের কাছে। কবিগুরুর সেই বাণী 'বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহার, সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারও'। আমাদের আনন্দ আমরা ছড়িয়ে দিতে চাই সকলের কাছে এবং তাতেই আমাদের আনন্দ আরও আরও বৃদ্ধি পাবে। আমাদের অনেক দিনের আশা এবং প্রচেষ্টা সফল করতে সকলেরই অবদান আছে তবু বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় মহারাজের কৃপাধন্যা শ্রীমতি শর্মিলা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম। তার ইচ্ছা এবং অদম্য প্রয়াসের জন্যই মহারাজের অগনিত শিষ্য-ভক্ত-অনুরাগীরা এক অমূল্য সম্পদ লাভ করল। আজ আমাদের প্রিয় মহারাজ সকল দেশের সকল মানুষের সাধনা এবং আনন্দের সাথী হলেন।

সারাদিনের আনন্দানুষ্ঠানের সমাপ্তিতে ভক্ত-অনুরাগীদের হাতে আনন্দ আশ্রমের পক্ষ থেকে প্রসাদের বাক্স তুলে দেওয়া হয়। এক আনন্দময় মন এবং স্মৃতি নিয়ে শেষ হয় আজকের অনুষ্ঠান।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিশ্বনাথদেব পরিকল্পিত
শ্রীশ্রী শ্যাঁম-শ্যামা পূজা

শ্রীশ্রীঠাকুর বিশ্বনাথদেব পরিকল্পিত, স্বামী শিবানন্দ গিরি মহারাজ আরাধিত শ্রীশ্রী শ্যাঁমশ্যামা পূজার (৮৩ বছর) আয়োজন করা হয়েছে আনন্দ আশ্রম প্রাঙ্গনে, আগামী ২১শে কার্ত্তিক ১৪৩৩ রবিবার, ৮ই নভেম্বর ২০২৬।

আপনার সবান্ধব উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়।



অনুভবের কথা
কন্যাদান

দেশলাইটি ঠুকে প্রদীপটি জ্বালি। প্রদীপ জ্বালা হয়ে গেলে কাঠিটা ফেলে দিই। এটাই নিয়ম। যদি না ফেলি ঘর নোংরা হবে। ওটা এখন অকারণ বোঝা। অকেজো জঞ্জাল। এটি খুব সত্যি কথা। জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে এটাই আমরা শিখেছি। কতবার ওমনি দেশলাই কাঠির মত পড়ে থেকেছি। কিন্তু ঐ কাঠিটাকে যদি জিজ্ঞাসা কর হ্যাঁগো তোমার এত তৃপ্তি কিসের? তোমার দুঃখ নেই কেন? কাঠি বলবে, আমার যে পূজা হয়ে গেছে। সেবা করে আমি যে ধন্য। আমার কাজ আমি যে করেছি। আমার যা দেবার আমি যে দিতে পেরেছি। ক'জন দিতে পারে?

শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, গীতার মূল কথা ত্যাগ। মরা মরা বলতে বলতে যেমন রাম রাম হয়ে যায়। গীতাপাঠ দূরের কথা, গীতা গীতা, পুনরাবৃত্তি করতে থাকলে 'তাগী তাগী' হয়ে যায়। তাগী অর্থাৎ ত্যাগী-ই। ত্যাগী। ত্যাগের মধ্যে একটা উৎসর্গ করা আছে। হাতে তুলে দেওয়া, প্রাণ ধরে দেওয়া, মনে প্রাণে দেওয়া আছে। নিবেদিতার মনে প্রশ্ন ছিল, ভারতবর্ষ এত কোমল, সুন্দরের উপাসক, শাশ্বত চিরস্থায়ী ভূমার তপস্বী। তাহলে 'বজ্র' এ ধর্মের প্রতীক হল কি করে। সর্বত্র বজ্র চিহ্ন। ইন্দ্রের হাতে বজ্র কেন? দুর্গার হাতে বজ্র কেন? বজ্র তো ক্ষণপ্রভা। বিদ্যুতের মত কড় কড় করে ভয়ংকর শব্দ করে ধ্বংসের রূপ নিয়ে তেড়ে আসে। বিবেকানন্দ সে কথা জানতে পেরে একটা চিঠিতে কি অপূর্ব লিখছেন, দধীচির কাছে দেবতারা ভিক্ষা চাইতে গেছেন। দধীচির বুকের পাঁজরাগুলো চাই। দেবতার হাতের বজ্র হবে। সবাই প্রতীক্ষা করে আছেন। ঋষি কি বলেন। ঋষি একটা কথাও বললেন না। অথচ উত্তর দিতে তাঁর মুহূর্ত ভাবতে হল না। সঙ্গে সঙ্গে দেহত্যাগ করে দিলেন। মৃতদেহ নয়, ঐ হাড় ক'খানা নয়, ত্যাগ দিয়েই বজ্র তৈরী হয়। ঐ প্রাণ ভরে উৎসর্গ করা। ঐ সংকল্প করে দান করা। স্বামিজী কিন্তু আরও একটু বলছেন। বলছেন, মনে রেখ, বজ্র দুর্ভেদ্য নয়। দুর্ভেদ্য সেই দেবতার হাত, যা বজ্রকে ধারণ করে। আমাদের কাজ মায়ের বেদীমূলে আত্মোৎসর্গ করে যাওয়া। দিয়েই আমাদের দান ব্রতের পূর্ণাহুতি। বৃক্ষ ফুলগুলো দিয়েছে, তরুরাজি ফলগুলো দিয়েছে বলেই পৃথিবী সুন্দর হয়েছে। ত্যাগই সুন্দর করেছে জগৎকে। দানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দান, কন্যাদান। একটু একটু করে বড় করে, স্নেহ প্রীতি দিয়ে সাজিয়ে জামাতার জানু ধরে দু'হাত তুলে দান করা। কি করুণ! কি মধুর! কি ভীষন কান্না, অথচ আনন্দের ঝরনা। কন্বমুণি শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার প্রাক্কালে বিদ্যাসাগরের সেই অনবদ্য কালীদাসের অনুবাদ, আমি মুনি, মায়ামুক্ত, আমার যদি অন্তর ঈদৃশ চঞ্চল হচ্ছে, না জানি সংসারী মানুষের মন কি হয়? ঐ ত্যাগটুকু মাথায় করেই সংসার শুরু। প্রত্যেকটি সংসার, প্রত্যেকটি পরিবার ঐ দান করা মালক্ষ্মী নিয়ে ঘরের লক্ষ্মী পাতে। গৃহবধু গৃহলক্ষ্মী। জীবনে অন্ততঃ একবার হাত পেতে চাইতে হবে। একবার অন্ততঃ হাত তুলে দেতে হবে। শ্রেষ্ঠ বস্তু চাইতে হবে। জীবনের শ্রেষ্ঠ বস্তু দিতে হবে।

পকেটে পাঁচটা টাকা আছে। যদি কেউ পকেট মারে, বা ঐ টাকা চুরি যায়, তাহলে দান করা হল না। যদি হারিয়ে যায়, খরচা করে ফেলে কিংবা গুন্ডাতে ছিনিয়ে নেয়, তাহলেও দান করা হল না। দেব বলেই দিতে

হবে। স্নেহ করে, ভালবেসে, শ্রদ্ধা করে, মনে প্রাণে দিতে হবে। ভয়ে ভয়ে দিতে হবে, চিন্তা করে দিতে হবে। এটি বেদের শিক্ষা। শিয়া দেয়ং, হিয়া দেয়ং, ভিয়া দেয়ং, ধিয়া দেয়ং। না দিতে দিতে, না পেতে পেতে আমাদের হৃদয়ে অনেক সুকুমার বৃত্তি মরে যাচ্ছে, শুকিয়ে যাচ্ছে। একটা গল্প আছে ত্রৈলোক্যনাথের। একটি নতুন বৌ শ্বশুর বাড়ীতে এসেছে। স্বামী খুব ব্যস্ত মানুষ। সময় নেই। আদর যত্ন স্নেহ মমতা কাকে বলে ভুলে যেতে লাগল। নতুন বৌ অনেকগুলি পাখী পুষেছিল। একদিন স্বামী কাজ থেকে ফিরে এসে দেখল সব ক'টি পাখী মরে পড়ে আছে। খাবার দিতে ভুলে গেছে নতুন বৌ। মরবার আগে জলটাও পায়নি। স্ত্রীকে ডেকে স্বামী বললেন, এ কি করেছ? নতুন বৌ নির্লিপ্তভাবে জবাব দিল, ও, মরে গেছে? চাকরকে ফেলে দিতে বলছি। স্বামীর এই প্রশ্নটি দরদ নয়। স্ত্রীর এই উত্তরটিও দান নয়। নতুন বৌ যদি খাঁচার দরজা খুলে পাখীগুলো ছেড়ে দিত, তাহলেও দান হত না। শুনেছি একবার এক ভক্ত বাজারে গিয়েছিল খই কিনতে। খই নিয়ে ফিরছে এমন সময় ঝড় উঠল। সামলাতে পারল না। খই উড়তে আরম্ভ করল। ভক্ত দেখল সব গেল। পয়সাও গেল, খইও গেল। কি করি? খইগুলো উড়ছে দেখে গোবিন্দায় নমঃ, গোবিন্দায় নমঃ বলতে লাগল। যাক উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ বলে গোবিন্দের ভোগে লেগে যাক। এটা পূজা হল না, সেবা হল না, দান হল না।

কঠ উপনিষদে আছে, ঋষি যজ্ঞ করতে বসেছেন। ক্ষীনজীবি দুর্বল বৎসধেনু ব্রাহ্মণদের দান করছিলেন। পুত্র নচিকেতা ব্যথিত হলেন। প্রশ্ন করলেন; আমি তো তোমার শ্রেষ্ঠ বস্তু। আমাকে কাকে দান করবে? শ্রেষ্ঠ জিনিষ দিতে হয়। বলেছিলেন ঋষি, তোকে যমকে দিলাম, যা। নচিকেতা সশরীরে যমালয়ে গিয়েছিল পিতৃসত্য পালন করতে। এনেছিল মৃতুলোক থেকে অমৃতের খবর। ত্যাগের দ্বারা ভোগ কর। তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জিথা। ঈশ ১।

আমাদের প্রত্যেকের জীবনে একটা দিন আসবে, যেদিন আমাদের দিতেই হবে। সব দিতে হবে, কিছুই রাখা চলবে না। আমার বলে যা পেয়েছি শুভক্ষণে যবে, তোমার করে দেব তখন তারা আমার হবে। সব দিতে হবে। সেই অন্তিম দিন, সেই চরম দিন, যেদিন জীবনের খেলা শেষ করে মার কাছে ব্যাট বল জমা দিয়ে যেতে হবে। সেদিন আমরা কি দেব? সব তো খরচা হয়ে গেল। কি রেখে যাব। আমার চোখের দেখা, আমার কানে শোনা, আমার হাতের নিপুন সেবা। আমার আনাগোনা। সব দিতে হবে। যেটুকু দেখবার সুযোগ পেয়েছিলাম খারাপ জিনিষ দেখতে দেখতেই খরচ হয়ে গেল। যেটুকু শোনবার, বলবার সুযোগ ছিল। অকথা কুকথা পরচর্চায় খরচ হয়ে গেল। যাক, সবার শেষে যা বাকী রয় তাহাই লব। তাতেই হবে। মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে আমরা কি জীবনটাকে তাঁর হাতে তুলে দিতে পারব? সন্দেশের ঠোঙাটা দোকান থেকে আনছিলাম, চিলে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল। তাহলে তো হাত তুলে দেওয়া হল না। ফুলের সাজিটা নিয়ে যাচ্ছিলাম নদী পার হয়ে। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, হাত থেকে পড়ে গেল নদীতে। তা হলেও তো দেওয়া হল না। মৃত্যু কি জীবনটাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে? ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে? অনবধানে হাত থেকে পড়ে যাবে? তাই তো এই সংকল্প। জীবনের শেষের দিনটির প্রতীক্ষা করব। তোমার হাতে তুলে দেব প্রাণটাকে। জীবনটাকে সাজিয়ে রাখব পূজার মত। তুমি আসবে, তোমার পায়ে দেব ব্যর্থ জীবনের যত অশ্রু। আমায় যে সব দিতে হবে সে তো আমি জানি, আমার যত বিত্ত প্রভু, আমার যত বাণী। রামপ্রসাদ এমনি প্রস্তুত হয়ে ছিলেন। তারা নাম সারাৎসার আপন শিখাগ্রে বেঁধেছি। রামপ্রসাদ বলে দুর্গা বলে যাত্রা করে বসে আছি। নইলে কে বলতে পারে, এবার শমন এলে হৃদয় খুলে দেখাব ভেবে রেখেছি। জন্ম মৃত্যু বিবাহ, সবটাই পূজা সবটাই দান।

—স্বামী শিবানন্দ গিরি



চিঠিপত্র

ওঁ

Preston
5th Aug. 78

কল্যানীয়াসু গোপা, স্নেহের কান্তিবাবা
কুমার - কৌশিক

লন্ডন থেকে আড়াই শ' মাইল দূরে পেস্টনে এসেছি। এখান থেকে ওয়ার্ডসওয়ার্থের লেক ডিস্ট্রিক্ট-এ এসেছি। প্রতি পাহাড়ে, ফুলে, ঝরণায় সায়রে ছেলেবেলায় পড়া কবিতাগুলো মনে আসে। সেই বিষয়, সেই হঠাৎ দেখার আনন্দ। এখানে আসার কথা ছিল না। রাত্রে কীর্তন, সকালগুলো ছুটি। তাই এত ছোটাছুটি।

বাবা কুমার, তোমার কল্পনাই আজ রূপ নিতে চলেছে। একটা ছেলে আমায় দুঃখ চলে না গেলে, আর একটা ছেলে কি বলতে চায় আগে জানতাম না। আমি গানে গানে, সভা-সমিতিতে ডুবে থাকি। আমাকে তুমি গাইড কর।

প্রিয় কান্তিবাবা, এই সময় এতদূরে থাকা ঠিক হচ্ছে কিনা বুঝতে পারছি না। আমি না থাকায় কাজ বন্ধ থাকা উচিত নয়। সেদিনের কথা মত Bank authority– power ইত্যাদি change করে এসেছি। Anandam নামেও A/c করে রেখে এসেছি। তাই অসুবিধা না হওয়ার কথা। এখন একজন Part-time ভাল Accountant প্রয়োজন। যুবুকে জিজ্ঞাসা করতে পার ফণী চক্রবর্তী স্বেচ্ছায় একাজ করতে পারে। যা Document রয়েছে তাই দিয়ে একটা Rough Account লিখে রাখা উচিত। Hand Book ছাড়া পরে ঠিক ঠিক লেখা মুস্কিল হবে। কারণ আমাদের expectation অপেক্ষা কাজ অনেক বেশী হয়েছে। মুস্তাফিদাকে চিঠি দেব। তোমরাও যোগাযোগ রেখ।

বাবা কৌশিক (Jnr.) No II, তোমার Ilup বহুদিন খাইনি। এখানে Regular Cocacola খাচ্ছি।

—মহারাজ



আনন্দ স্বরূপ শ্রীমদ্ স্বরূপানন্দজী

অখন্ড মন্ডলেশ্বর স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসজী মহারাজ কোলকাতার কাঁকুরগাছির শ্রীগুরুধামে স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে মহাসমাধি নিলেন গত ২১ এপ্রিল'৮৪, শনিবার সকাল ৬-৩০টায়। আর মাত্র দু'টো বছর বেঁচে থাকলে তনি নিজেই তাঁর জন্ম শতবার্ষিকী করে যেতে পারতেন। বোঝা গেল তা তাঁর উদ্দেশ্য নয়। মহানির্বানের সাতদিন পর ২৭শে এপ্রিল'৮৪ শুক্লা দ্বাদশীর দিন সকালে শ্রীগুরুধামের নিচের ঘরে, যেখানে তিনি নিত্য সমবেত প্রার্থনা সভায় ওঙ্কার বিগ্রহের সামনে আত্মস্থ হয়ে থাকতেন, সেখানেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হল। সাতদিন ধরে অবিরাম চলেছে দর্শন। প্রতি মিনিটে ১২০ জন দর্শনার্থী প্রণাম করে গেছেন। এ দৃশ্য অবিশ্বাস্য। ঋষি অরবিন্দ যখন মহা সমাধি নিলেন তখন তাঁর সাধনদেহটি তিন দিন রেখে দেওয়া হয়েছিল দর্শনার্থীদের সুযোগ দেওয়ার জন্য। স্বামী স্বরূপানন্দজীর সিদ্ধদেহটি সাতদিন তাঁর নিজের ঘরে নিজের বিছানায় শুইয়ে রাখা হল অগণিত মানুষের শেষ দেখার ইচ্ছা পুরোণ করার জন্য। গিয়ে দেখলাম নিত্যকার নিয়মে শ্রীবিগ্রহকে স্নান করানো হচ্ছে, ভোগ দেওয়া হচ্ছে। এরকম কোন নজির আছে বলে আমি জানিনা। সমাধির সময় দেখলাম তাঁর দেহ নরম, সহজ, স্বাভাবিক, আলোকোজ্জ্বল, জ্যোতির্ময়। কোন বিকার নেই। স্বামী স্বরূপানন্দজী কুম্ভমেলায় সন্ন্যাস নিয়েছিলেন। কিন্তু সারা জীবন সাদা কাপড় পড়ে কাটালেন। সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রেরণা জাগাবার জন্য সাধারণ ধুতি পাঞ্জাবী পড়ে থাকতেন। নিজেকে সাধু বলে চিহ্নিত করতে চাননি। কোন গুরু পরম্পরা চালু করতে চাননি, চাননি কোন পরম্পরার জের টানতে। তাই তিনি প্রকাশ করেন নি তাঁর সন্ন্যাস গুরুর নাম। স্বরূপানন্দজীর পিতা ছিলেন ভোলাগিরি মহারাজের শিষ্য। স্বরূপানন্দজী ছিলেন সকলের বাবামণি। কাজের মানুষ। পরিবারের একজন। ধর্মটা জীবনের বাইরে নয়। গ্রামে গঞ্জে বসতবাড়ীতে না আনতে পারলে ধর্ম থেকে যাবে সুদূর তীর্থে, পর্বতে, অরণ্যে। ধর্ম আনতে হবে জীবনে। সংযম, ব্রহ্মচর্য, সত্য, ন্যায়, নিষ্ঠা। সাধুতা যদি ঘরে ঘরে বিরাজ না করে তাহলে সার্থকতা কোথায়? সাধুতার টানে ঘরের মানুষ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলে সমাজ গঠন, কর্মযজ্ঞ, দেশ সেবা চলবে কি করে? কর্ম ত্যাগ নয়। ত্যাগী যুবক চাই স্বার্থহীন সেবার কাজ কাঁধে তুলে নেবার জন্য। স্বাধীনতার জন্য মুক্ত সংগ্রামে বীর বিপ্লবীদের হাতে হাতে তাঁর বই পাওয়া যেত। চট্টগ্রাম আন্দোলনে তাঁর বাণী অগ্নিমন্ত্রের মত কাজ করেছিল। বারবার স্বামীজীকে বিদেশী শাশকের নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। দীর্ঘকাল কারাবরণ করতে হয়েছে। তাঁর দৃষ্টিতে স্বদেশের মুক্তি সাধনা, জাতি গঠনের প্রচেষ্টা আর ঈশ্বর উপলব্ধির প্রয়াস পৃথক নয়।

স্বরূপানন্দজীর কাছে ধর্মের উদ্দেশ্য চরিত্র গঠন। চরিত্র গঠন না হলে ধর্মের সকল উদ্দেশ্যই নষ্ট হয়ে যায়। তাই তাঁর আন্দোলন হল 'চরিত্র গঠন আন্দোলন'। ব্রহ্মচর্যই জাতিকে বীর্যবান করে। শক্তিমান করে, বিজয়ী করে, ধীমান করে। তবু তিনি জীবনের প্রয়োজনকে স্বীকার করেছেন, দুটি একটি সন্তান নিয়ে

স্বামী স্ত্রী ছোট পরিবারই আধ্যাত্মিক সাধনার শ্রেষ্ঠ ইউনিট। বর্ণ জাতিভেদ তিনি মানেন না। অর্থ, বিদ্যা, প্রতিপত্তির কৌলীন্যও তিনি স্বীকার করেন না। সবাইকে ডেকেছেন সমবেত প্রার্থনায়। সকলকে দিয়েছেন ওঁকারে দীক্ষা। ব্রাহ্মী গায়ত্রী। সহজ উপাসনা। চোখের সামনে অন্য কোন বিগ্রহ নয় । এমনকি তাঁর নিজের ছবি রাখতেও বারণ করেছেন। শুধু ওঁকারের মূর্তিই থাকবে বেদীর উপর। একত্রে সকলে একই প্রসাদ পাবে। কোন ভেদ বুদ্ধি থাকবে না। সংসারী গৃহীদেরও সংযম ব্রহ্মচর্য পালন প্রয়োজন। এই ছিল তাঁর উপদেশ, আবেদন।

গ্রামের মানুষের অর্থকষ্ট তিনি দেখেছেন। কর্মে মধ্যে দিয়ে অভাব দূর করতে চেষ্টা করেছেন। হাজার হাজার চারাগাছ কিনে বিনামূল্যে দিয়েছেন। বলেছেন গাছ পোঁত, জল দাও, যত্ন কর, ঐ গাছ বড় হয়ে তোমাদের সেবা করবে। শুধু কথা নয়, কাজে পরিণত করেছেন তাঁর পরিকল্পনা। বড় বড় জলাশয় প্রতিষ্ঠা করেছেন। যেখানে জলকষ্ট সেখানে গিয়েছেন, গ্রামবাসীকে বলেছেন তোমরা মাটি কাটো আমি তোমাদের খাওয়াবো। ওরা কাজ করেছে, খেতে পেয়েছে। ওদের নিজেদের কাটা জলাধার ওদেরই জলের অভাব দূর করেছে। তাঁর এই মৌলিক প্রচেষ্টায় অদ্ধ-শতাব্দীর দেশে ‘বনমহোৎসব’ খাদ্যের বিনিময়ে কাজ’ সরকারী পরিকল্পনায় স্থান পাচ্ছে।

নিজের মুক্তির জন্য সন্ন্যাস নয়। আত্মস্বার্থ বিসর্জন দিয়ে সকলের সেবাই কাজ। সর্বস্ব উৎসর্গ করে কাজ করার জন্য ত্যাগী যুবক যুবতী চাই। কেন ঋত্বিকের সাহায্য না নিয়ে তিনি একক জীবনে ৯৮-টি বছরে দশলক্ষ শিষ্য-শিষ্যা রেখে গিয়েছেন। এ এক বিস্ময় সন্দেহ নাই।

—স্বামী শিবানন্দ গিরি মহারাজ

‘শিবানন্দ স্নেহনীড়ে’ শারদীয়া মহাষ্টমী পূজা

আগামী ১৯শে অক্টোবর, ২০২৬, সোমবার (বাং ১লা কার্ত্তিক ১৪৩৩) সকালে ‘কৈলাস’-এর আগরপাড়াস্থিত সেবাকেন্দ্র শিবানন্দ স্নেহনীড়ে শারদীয়া মহাষ্টমী বিহিত পূজা নিবেদিত হবে আমাদের শ্রীগুরু স্বামী শিবানন্দ গিরি মহারাজের উদ্দেশ্যে। সকলের উপস্থিতিতে এই পূজা সার্থক হোক।



ফিরে দেখা — প্রথম সংখ্যার প্রথম সম্পাদকীয় .....

অয়ম্ আরম্ভ

প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব 'হাউস জার্নাল' আছে অতএব আমাদেরও একটা 'গৃহ দেবতার' মত 'গৃহ পত্রিকা' চাই, এমনি কোন চিন্তা নিয়ে আমাদের এই পত্রিকার জন্ম নয়। আমাদের মহারাজ বলেছেন, ছোলা বস্তায় ভরে ভাঁড়ারে তুলে রাখলে কলকা বেরোয় না। ছোলা ছোলাই থাকে। কিন্তু জলে ভিজিয়ে রাখলে প্রতিটি মুহূর্তে তার পরিবর্তন হতে থাকে। রাত পেরুলেই কলকা বেরিয়ে আসে। ভেতরের দানা দুখন্ড হয়ে যায়। খোসা বলে দেয় আমি দেহের কেউ নই। দেহ বলে দেয়, আমি আত্মার কেহ নই। আর এই পৃথক স্বত্ত্বা বোধ যেই জাগল, অমনি ছোলা আর ছোলা থাকে না। ক্রমশঃ পল্লবে পল্লবে বেরিয়ে আসতে থাকে। কেন বেরিয়ে আসে? সে যে আত্মকে জেনেছে। ঘরটাই ঘরের মানুষ নয়, একথা জেনেছে। যেই উপলব্ধি জাগ্রত হয় অমনি তার আত্মার মধ্যে তীব্র গর্জন শুরু হয়ে যায়, পল্লবিত ছোলা বৃক্ষে পরিণত হতে চায়। আত্ম প্রকাশ চায়। মাটির স্পর্শ চায়। রোদ বৃষ্টি চায়। আত্মার মধ্যে ছোলাটাও গুমরাচ্ছে। একটা ছোলা শত শত ছোলা হতে চাইছে। এই বেরিয়ে আসার আবেগই তো ছোলার বৃক্ষরূপ পরিগ্রহণ। সেইখানেই পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।

শিশুর পিতা ঘুমিয়ে আছে শিশুর অন্তরে। শিশুটি পূর্ণাঙ্গ হওয়া মাত্র আর মাতৃগর্ভে থাকতে চায় না। বেরিয়ে আসতে চায়। নইলে পূর্ণাঙ্গ বিকাশের সম্ভাবনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। এই জন্যেই আমাদের এই পত্রিকা। প্রকাশের মধ্যে বিকশিত হবার জন্য।

শাস্ত্র কথা অনুশাসন মনঃশিক্ষা, জপতপ ধ্যান, পঠন পাঠন নাম-গান খুবই আলতো করে 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' নীতিতেও করতে পারি। আবার রাসায়নিক মিশ্রণের মত নব নব অণুভূতিতে মনকে নব জন্মও দিতে পারি। রসে রসে মিলতে মেলাতে যে জানে, সেই তো হবে সেরা রাসায়ণিক। তবেই তো সে রসিক।

অতুলবাবুর আশীর্বাণী

১৯৫৭ সালে মহালয়ার দিন আনন্দম্ পত্রিকার নামকরণ করে আনন্দম্ পত্রিকার নামকরণ করে ঢাকার ভূত-পূর্ব্ব প্রাক্তন এম, এল, এ, অধ্যাপক অতুল প্রসাদ সেন মহাশয় বলেছিলেন, 'তোমাদের কাগজ শুধু নামেই সার্থক হলেই চলবে না, লক্ষ্য সাধনেও সার্থক হতে হবে। বলেছিলেন অনেক ভেবে চিন্তে লক্ষ্য সাধন শব্দটি প্রয়োগ করলাম। আনন্দ আশ্রমের যাহা লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সেটাই সাধিত হবে তোমাদের কাগজের মাধ্যমে। আংশিকভাবে হলেও। আংশিক হোক আপত্তি নেই, কিন্তু কোন কারণেই কোনদিন লক্ষ্য বিরোধী কোন কথা তোমাদের কাগজে প্রকাশিত হবে না।'

কুড়ি বছর আগে অধ্যাপক সেন যা বলে গেছেন আজ তা আমাদের চলার পথের দিশারী। প্রবন্ধে বন্দনা সংকলন গ্রন্থে অধ্যাপক সেনের চিঠিটি পূণঃ প্রকাশিত হয়েছে। নিজেই তিনি প্রশ্ন করেছেন, অবিশ্বাসী বা অল্প বিশ্বাসী সমালোচক প্রশ্ন করতে

পারেন, এইরূপ নীরস কাগজ কি আজকের দিনে চলবে। নিজেই উত্তর দিয়েছেন চিঠিতে, না চলুক, কিছু আসে যায় না। কাগজ চালাতেই হবে কে বলল? ঘরে ঘরে ফিরি করেও দুধ বিকোয় না বলে বাজারে মদের দোকান খুলে বসতে হবে নাকি? আর মদই শুধু বিকোয় দুধ বিকোয় না একথাই বা কে বলল? সত্য বটে আধুনিক শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত সমাজে শোচনীয় রুচি ও স্বাদ বিকৃতি ঘটেছে। পোষ্টাই জিনিষ সহজে ধরতে চায় না- কিন্তু মধুমিশ্রণে মুখরোচক করে দিলে ধরতেও বেশী দেরী হয় না। তোমরা তো দেখেছ, আশ্রম প্রতিষ্ঠাতা ঠাকুর বিশ্বনাথের অপূর্ব দুগ্ধ-মধু পরিবেশন লীলা। তোমাদেরও ঠাকুরের এই অপূর্ব দুগ্ধ-মধু পরিবেশন লীলার কৌশলটি আয়ত্ত করতে হবে। তা হলেই তোমাদের আনন্দম্ স্বাদ বিকৃতির যুগেও অচল হবে না।

আশীর্বাণীতে ভবিষ্যৎ বাণী
লেখক গোষ্ঠী গড়ে উঠবে

কুড়ি বছর আগে মহারাজকে লেখা এই চিঠি আজ আমাদের সম্পদ। যেন আজকের জন্যই শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রিয় অতুলবাবু কথাগুলি লিখে গেছেন। বলে গেছেন আমাদের কাজের পার্থক্যের কথা। 'ঠাকুর তাঁর ইষ্টের সন্ধান ও প্রকাশের জন্য অবগাহন করতেন সুরের সুরধুনিতে। কিন্তু তোমরা সেই ইষ্টকে প্রকাশ করার চেষ্টা করবে সাহিত্যের মাধ্যমে। পার্থক্যে কিছু আসে যায় না, যদি পরম বস্তুকে ধরা যায়। ও বস্তুর স্বভাবই এই যে, তাঁকে ধরতে পারলে, যে ধরে শুধু যে তার জীবনই মধুময় হয় তাই নয় পরন্তু সংগীত, চিত্রাঙ্কন, সাহিত্য, এমন কি যুক্তি, বিচার তর্ক যে কোন মাধ্যমেই সে তা প্রকাশ করতে চেষ্টা করুক না কেন সকল মাধ্যমেই হয় মধুময়, মানুষকে করে আকর্ষণ। আর সেই পরম বস্তুকে না ধরে কথা বলতে গেলে সব কথা হয় 'ভেক কোলাহল, সব লেখা শুধু হিজিবিজি'। সুতরাং যদি তোমরা লিখতে চাও, তোমাদের লেখা হয় যেন ইষ্টের সাধন। ঠিক নাম সাধনের মত। নাম-নামী যদি অভেদ হয় তবে নামে ভেতর যেমন নামীকে পাওয়া যায়, তোমাদের লেখার ভেতরও তাঁকেই পাবে। কেবল তোমরা নও, তোমরা যে পরিমাণে পাবে, তোমাদের পাঠক সম্প্রদায়ও সেই পরিমাণে পাবে। ঠিক নামকীর্তনকারীর হৃদয় যে বস্তুর স্পর্শ এবং আস্বাদ পায়, নামশ্রবণকারীও আধারের যোগ্যতানুযায়ী তেমনি অনুভূতি লাভ করে। ঠিক সেইরূপ তোমরা নিজেরা এইভাবে লিখতে আরম্ভ কর। এবং লিখেই যাও। দেখবে তোমরা বালক হলেও তোমাদের কেন্দ্র করে অচিরেই এমন এক লেখক গোষ্ঠী গড়ে উঠবে যাদের লেখনীমুখে অবিরাম অমৃতক্ষরণ হবে। কৃষ্ণমুখী নামকারীকে কেন্দ্র করে যেমন কীর্তনমন্ডলী গড়ে ওঠে। ঠিক সেইরূপ।'

চিঠিটি শেষ করার সময় অতুলবাবু বলেছিলেন, 'শ্রীশ্রীঠাকুর অপ্রকট হয়েও বর্তমান আছেন। তোমরা তোমাদের ঠাকুরকে অবিচ্ছিন্ন স্মৃতির বন্ধনে বেঁধে রেখ। তাঁর কথাই প্রচার করার চেষ্টা করো। দেখবে আনন্দম্ পরিচালনার শক্তি তিনিই দান করবেন।

আজ আমাদের দুটি ভাইয়ের যমজ জন্মদিন। একদিকে পত্রিকার যাত্রা শুরু হল। আর আনন্দম্ গ্রন্থাগারেরও শুভ উদ্বোধন। আগে পড়, তারপর লেখ। আগে বোঝ তারপর বল। আগে উপলব্ধি কর, তারপর প্রচার কর। সংঘ সভাপতির এই নির্দ্দেশ।

ঃ শুভায়ভবতু ঃ

—শ্রীবিশ্বজিৎ মজুমদার

পাঁচ সিকে পাঁচ আনা

কৈলাসের মাসিক সংঘ সংবাদ পত্রিকা

।। **নিয়মাবলী**।।

- প্রতি বাংলা মাসের পূর্ণিমায় প্রকাশিত হয়।
  মাসিক চাঁদা তিন টাকা। বার্ষিক চাঁদা ত্রিশ টাকা।
- অতিরিক্ত ডাক খরচ লাগে না।
- পত্রিকা সময়মত না পেলে লিখে জানাতে হবে।
- সংঘের সংবাদ পরিবেশন, কীর্তন এবং সভায় আলোচিত গবেষণামূলক মূল্যবান তথ্যগুলি সংগ্রহ, নিদিধ্যাসন পত্রিকার উদ্দেশ্য।
- অতি মানব ও মহাপুরুষদেরজীবন ও মর্মবাণী সংগ্রহ এবং গবেষণা পত্রিকার প্রধান কাজ।
- প্রসঙ্গগুলি আশ্রমে বা আশ্রম আয়োজিত সভায় আলোচিত হবার পরই একমাত্র পত্রিকায় প্রকাশ লাভ করে।
- বৎসরের যে কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়।

সম্পাদিকা—শর্মিলা ব্যানার্জী, ২১/২ বিডন স্ট্রীট, কলকাতা-৬
প্রকাশক—অর্পণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২১/২ বিডন স্ট্রীট, কলকাতা-৬। ফোনঃ ২৩৫২-৭৩২৯
মুদ্রক—শান্তিনাথ প্রেস, ১৬ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলকাতা-৬

Statement about ownership and other particulars of

PANCH SIKE PANCH ANA (FORM - IV)

According to rule 8 of the Registrations of News Papers (central Rules 1956)

Place of Publication	Kailash, 21/2, Beadon St. Kol-6
Periodicity of Publications	Monthly
Printer's Name	Sri Arpan Bandyopadhyay
Nationality	Indian
Address	Kailash, 21/2, Beadon Street, Kolkata-6
Publisher's name	Sri Arpan Bandyopadhyay
Nationality	Indian
Address	Kailash, 21/2, Beadon St. Kolkata-6
Editor's Name	Sarmila Banerjee
Nationality	Indian
Address	Kailash, 21/2 Beadon St. Kolkata-6
Name and Address of the Individuals who own newspaper	Kailash 21/2, Beadon St. Kolkata-6

Vol. XXXXX No-2 (আশ্বিন)
Publication Date : 7th October-2026

পাঁচ সিকে পাঁচ আনা

(Panch Sike Panch Anna)

Postal Regn. No. : KOL RMS / 38 / 2025-2027
Central Regn. No. : R. N. 32810 / 1977
Licensed to Post without Prepayment

ডাকবাক্সে চিঠি ফেললে যেখানকার চিঠি সেখানে পৌঁছে যায়। গাছের মূলে জল দিলেই গাছের বিভিন্ন শাখা প্রশাখা, পত্রাবলীতে জল পৌঁছে যায়। বিগ্রহে প্রণাম করলে তেমনি যাঁর প্রণাম তাঁর কাছে পৌঁছে যায়। রাজাকে তো চিনিনা, রাজার দপ্তরে আবেদন জানালেই আপদকালীন সাহায্য তাইতেই এসে যায়।

—স্বামী শিবানন্দ গিরি

Published and Printed by–Sri Arpan Bandyopadhyay, on behalf of Kailash, 21/2, Beadon Street, Kolkata-700 006 and Printed at–Santinath Press, 16 Hemendra Sen Street, Kolkata- 700 006 • Edited by–Sm. Sarmila Banerjee, 21/2 Beadon Street, Kolkata-700 006 • Owned by Kailash, 21/2, Beadon Street. Kolkata-700 006.